অনিকেতন

আবদুর রউফ চৌধুরী

অষ্টম অধ্যায়

বাদ মাগরেব ।

বাঙালি মেয়ের স্বাভাবিক শ্যামল রূপের উজ্জ্বল আভায় উদ্‌ভাসিত তার মুখাবয়ব । বাঙালিসুলভ লাজনম্র সভাবপ্রকৃতি । অপরিচিত পুরুষের মুখোমুখি বসতে পারে না, শালীনতায় বাঁধে; আবার পেছন ফেরেও বসা অভদ্রতা; এজন্য পাশ ফেরে রহিমা বসে আছে হয়ত । মুখমণ্ডলের দক্ষিণপাশ শুধু কাজীর নজরে পড়ল; নাকে সোনার ফুল, বড় ফুল হওয়া সত্ত্বেও বেমানান মনে হচ্ছে না, বরং আলোকিত দেখাচ্ছে । আর্যদের মতো বাঙালির উন্নত নাক না আবার চাপা নাসিকাযুক্ত চীনের মতো বেঁটেও না; মাঝামাঝি একটা আকার বেছে নিয়েছে, এ-নাকে রহিমাকে মানিয়েছে বেশ । মাঝারি গোছের মুখ, গোলগাল, মেইকাপ ক্রিমের মিষ্টি সুরভি । কানে সোনার দোল, এতে দৃষ্টি নন্দিত হয়, ভালোও লাগে । শাড়ি চয়নে ও পরনে রুচির পরিচয় পরিস্ফুটিত, মণিপুরী তাঁতের শাড়ি । গোল গলার হাফহাতা ব্লাউজ । বয়স মনে হয় ত্রিশের কাছাকাছি, তিন সন্তানের জননী হয়েও বাস্তবিকই সে সুন্দরী । কিছুক্ষণ ধরে কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রহিমা; তাকে ঘিরে বসার ঘরটায় অদ্ভুত এক নিঃশব্দতা বিরাজ করছে । রহিমার পাশে উপবিষ্ট তার চাচা বশর খান, চাউনি তার অপহৃত গৃস্থের বাসগৃহের মতো শূন্য; এলোমেলো, এলোমেলো । কাজী আর বশর খান মুখোমুখি বসে আছেন অথচ কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছেন না, কোনো কথাও না । হঠাৎ রহিমার চাচা বলে উঠলেন, বড়ো আশা নিয়ে ভাতিজিকে কলেজে ভর্তি করেছিলাম । কিন্তু পড়া হল কোথায়? তার বাবা প্রলোভনে পড়ে আমাকে না জানিয়ে বয়স্ক এক লন্ডনির কাছে রাতারাতি বিয়ে দিলেন । উদ্দেশ্য ছিল দামান্দের বদৌলতে ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে টাকার আফসোস মিটিয়ে নেবেন; আমি তো আর তার মিষ্টি কথায় আঁটি বেঁধে টাকা আর দিতে পারছি না তাই ।

বশর খান দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন; হৃতসর্বস্ব পথচারীর মতো । তার বক্তব্যের গভীরতা আর গাম্ভীর্যতা লক্ষ্য করে কাজী থমকে গেলেন; কিন্তু কিছু বললেন না । সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করলেন বশর খান । বাঁ দিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে কি যেন খুঁজলেন, দেশলাইয়ের বাক্সই হবে, তবু পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা বেরুল না । খালি হাতটা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বের করতে বরতে আবার কথা শুরু করলেন, যে-মেয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আশা ছিল আজ তার কারণেই ইজ্জত যায় যায়, যেটুকু ছিল সবটুকু ।

রহিমার হঠাৎ মনে হল সে ভীষণ অসহায় । সে কোনোদিনই যেন স্বামীর ভালোবাসা পায়নি । ভালোবাসা না অন্য কিছু সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না । রহিমা ভাবতে চেষ্টা করছে, স্বামী কোনোদিন ওর জন্যে অপেক্ষা করেছিল কিনা, মনে পড়ছে না, মনে হয় সারা জীবন ধরে ও-ই শুধু অপেক্ষা করেছে স্বামীর জন্যে । যেদিন স্বামী দেরি করে ফিরেছে সেদিন সে অধৈর্য ফিল করেছে শুধু, কিন্তু কঠোর বাক্য ব্যবহার করেনি । সান্ত্বনার সুরে কাজী বললেন, মেয়েটা ভুল করেছে তবে সর্বনাশ কিছুই করেনি । মানুষ ভুল করেই না তবে বুঝে । সে

ভুল শোধরে নেওয়াও যায়। ঠিক পথে আবার চলাও যায়। অতীতকে বিস্মৃতির অতলে ফেলে দেওয়াই সকলের কর্তব্য। ত্রুটি সংশোধনের সৎসাহস একটা শিক্ষিত মেয়ের থাকা উচিত।

জানালার কাছে উঠে এলেন কাজী। বিলেতে শীতকালে সন্ধ্যা আসে খুব তাড়াতাড়ি, তিনটা সাড়ে তিনটার মধ্যেই প্রকৃতি যেন আন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভারি পর্দাটা টেনে দিতে গিয়ে বাইরে, অন্ধকারের দিকে তাকালেন। অন্ধকার আর বৃষ্টি। বৃষ্টি আর অন্ধকার। শুধু দূরে দু-একটা আলো জ্বলছে। ভাবলেন, ঢালু রাস্তা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে পিচ্ছিল হয় সহজে, অসাবধানে পা পিছলে যায়। আর প্রকাশ্যে বললেন, কি বলো গো মা?

হঠাৎ এমনি ধরনের প্রশ্নের জন্য অপ্রস্তুত ছিল রহিমা, ওর মন ভেসে চলছিল চিন্তার স্রোতে। দ্রুত। আচমকা এ প্রশ্নে সে চমকে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হতে চাইল। কাজীর কথার উত্তরে রহিমার ঠোঁট ফাঁকে ছোট্ট একটা শব্দ অস্ফুটে বেরিয়ে এল, 'জি।' এ-শব্দটা সম্মতিসূচক হতে পারে, আবার প্রশ্নবোধকও হতে পারে। এ-দুয়ের মাঝখানের অর্থ বুঝানোর উদ্দেশ্যে একটা সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ যেন। সে নিজেই জানে না কি বলতে চাচ্ছে, কিন্তু কিছু একটা না-বললেই না; তাই এ ধরনের 'জি' কণ্ঠে দিয়ে প্রকাশ পেল। রহিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাজী বললেন, তুমি হয়ত ভাবছো স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে, পিতার স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রতিশোধ নেবে; কিন্তু এ যে হয়ে যাবে 'নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ' করার সমতুল্য। তোমার নাকের ক্ষত ঢাকবে কি দিয়ে? এ বদনাম যে তোমাকে বহন করতে হবে আজীবন।

রহিমার মনে ধাক্কা লাগল; যা বুকের মধ্যে গভীরভাবে দাগ কাটে। একটা আচ্ছন্ন অবস্থার শিকার সে। রহিমা নিজেই অবাক! এতদিন ধরে যাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করছে, যাকে শুধু স্মৃতির পাতায় নাড়াচাড়া করেছে, কাজীর সামান্য দুটো কথায় তার বুকের মধ্যে এমন তোলপাড় উঠল কেন! ওর সমস্ত মুখ জুড়ে কেমন একটা চাপা ছায়া ঘনিয়ে উঠল। এ-মুখ দেখে কাজী দৃঢ়তার কণ্ঠে বললেন, আমি এ-কথা এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি অন্য লোককে ভালোবেসে বিংশ শতাব্দীর জোলেখার অভিনয় করছো; বরং আমি বলবো সে লোকটা তার কুমতলব হাসিল করার জন্য তোমার অতৃপ্ত মনের অনলে ইন্ধন যুগিয়ে তোমাকে আসক্ত করার চেষ্টা করছে। তোমার কি উচিত স্বামীকে শায়েস্তা করার জন্য শয়তানের আশ্রয় নেওয়ার?

বৃষ্টির দাপটে ভেজানো কপাটের ফাঁকে দিয়ে গলিয়ে আসা এক টুকরো হাওয়া ফুরুত করে বসার ঘরে প্রবেশ করল; রহিমার মনও এ-সঙ্গে আছড় খেলো, আছড় খেলো স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেয়; যেন যৌবনের সন্ধিক্ষণের মতোই স্বামীকে দেখতে এবং দেখা দিতে। রহিমা এ প্রথমবারের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাল কাজীর দিকে। ডাগর অবাক পলকহীন রহিমার চোখে কাজী দেখতে পেলেন স্মৃতির একটা আশ্চর্য তরঙ্গ। লজ্জা, অভিমান হয়ত-বা কিছুটা অপমানের ছায়াও। কাজীর ভেতরটা নড়ে উঠল, অবাক লাগল কাজীর— একটা ছোট্ট ভুলের জন্য আজ রহিমা ভেবে বসে আছে সে হেরে গেছে। অথচ ....।

কাজী তার 'কুটিমুটি' মেয়েকে চা-নাস্তা আনার তাগিদ দিয়ে রহিমার তকদীর তলিয়ে দেখার তদবীরে লেগে যাওয়র জন্য মনস্থ করলেন। রহিমাকে আবার দেখে নিলেন। রহিমা যেন কি বলতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। গলার স্বর আটকে যাচ্ছে। একটা মেয়ে এ-জীবনে কিই-বা পেতে পারে! রহিমার বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথার কনকনানি, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা, সহস্র দীর্ঘশ্বাস, লুকানো কান্না, যৌবনের অসহ্য যন্ত্রণা, তীব্র অভিমান– সবকিছু মিলে ওর বুককে ভারি করে তুলেছে।

বাড়ির আসবাবপত্রগুলোর উপর চোখ বোলাচ্ছেন বশর খান; দামী কার্পেটে মোড়া মেঝে, ভারি পর্দা, বইয়ের আলমারি; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বললেন না। আর কাজী নিজ মনে সন্ধান করতে লাগলেন। তদবীরের ফলাফল লেখা থাকে তকদীরে। আল্লাহ ভবিষ্যৎ জানেন কিনা তাই! তবে তকদীর কোনো জীবনের নিয়ন্তা না। মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার তকদীরকে তৈরি করতে সে নিজেই সক্ষম। ভাবনা থেকে ফিরে এসে কাজী বললেন, তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে, ভুল আমরা সবাই করি, তুমিও করেছো, এখন সে ভুল শোধরে নিলেই হয়।

রহিমার স্বামী আজ পঞ্চাশের কোটায়। বিলাতের লেবার মার্কেট সংকুচিত করার অভাবনীয় কলাকৌশল অবলম্বন করে টোরি সরকার ক্রমশ যে বেকার সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে, তা আঘাত করেছে সবার আগে রহিমার স্বামীর মতো প্রবাসি বাঙালিকে; তাই তো বেকার জীবনের গ্লানি থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য রহিমার স্বামী কাজ নেয় একটা রেস্তোরাঁয়। আর এ-রেস্তোরাঁর মালিক বদরুল বাতিয়ে দেয় রহিমার স্বামীকে যে, এ-কাজের খবর সরকারকে না-দিলে বেকার ভাতা পুরোপুরি ভোগ করতে পারবে। এতে রহিমার স্বামী খুশি হয়; কিন্তু এ-ত্রির্বিধ দুর্বলতার সুযোগ নেয় বদরুল। শুরু হয় রহিমা-বদরুলের সম্পর্কটা। কাজী একটু গম্ভীরভাব চোখেমুখে এনে জোর দিয়ে বললেন, তোমার স্বামী যে ভুল করেছে তা সে সংশোধন করবে। তুমি যা চাও তা বুঝিয়ে বলো, সে অবশ্যই দেবে। তোমাকে অদেওয়া কিছুই থাকতে পারে না! নতুন করে আবার জীবনতরীর পাল তুলে দাও। অনুকূল বাতাসে তরী ভেসে চলবে জীবননদীতে আপন মনে দোলতে দোলতে।

রহিমা দৃষ্টিনিবদ্ধ করল অতীত দাম্পত্যজীবনের অন্ধকারে। অতীতে সে তার স্বামীর সামনে নিজেকে ভিখারিনীর ভূমিকায় দেখে এসেছে। নিজেকে ভেবেছে বঞ্চিত, দুঃখী, নিঃসঙ্গ। অন্ধকার শুধু ভয় দেখায় না, তার মধ্যে নিরাময় শক্তিও নিহিত থাকে; যার সাধনে মানুষ ফেরেশতার অবস্থানে উত্তীর্ণ হতে পারে। হয়ত-বা তা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। বোঝানোও যায় না, বোঝা শ্রম সাধ্য, অনুমোদিত ব্যবস্থা সাপেক্ষ; তা প্রকৃতি ও পরমত্মার নিগুঢ় সত্ত্বায় জটিলতায় আবদ্ধ। অন্ধকার মহাসত্য সোপান শৃঙ্গের অবারিক প্রহরীমুক্ত দ্বার। এ অন্ধকার রহিমাকে শক্তি দিল। আগামীতে সে স্বামীর সামনে অন্যরূপ নিয়ে দেখা দেবে। রহিমা তাকাল কাজীর দিকে। তারপর আঁচলকে আঙুলে জড়িয়ে ধীরে ধীরে বলল, নিজস্ব বাসা করলে তা উভয়ের নামে রেজিস্ট্রি করতে হবে।

— অবশ্যই সে করবে। কাজী ভাবলেন এখানেই এ-প্রসঙ্গের ইতি টানা উচিত। রান্নাঘর থেকে থালাবাটির ঠুংঠাং আওয়াজ ভেসে আসতেই কাজী বললেন, এখন রান্নাঘরে যাও গো মা। তড়িঘড়ি যাতে খেয়ে নিতে পারি সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখো আমার ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে।

রহিমা উঠে রান্নাঘরে গেল; সমস্ত আনন্দও যেন চলে গেল তার সঙ্গে। রহিমাকে সহজ হওয়ার সুযোগ করে দিলেন কাজী; আর এ সুযোগে ভাবতে বসলেন তিনি। এক যুগের ব্যবধান নিয়ে দুটো জীবন একসঙ্গে চললে প্রতিনিয়ত আসে কত ছোট-বড়ো বাঁধাবিপত্তি। সামান্য আপত্তিতে দুর্বলভিত্ত উত্তাপিত হয়, সংসার-অঙ্গন গরম হয়ে যায়; ফলে নিশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। একজন চায় লায়লী-মজনু খেলা; অপরজন ফকিরী মেলা। একজন শুনতে চায় রুনা লায়লা অপরজন তন্ময় হয় বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানীর জীবনীতে। এত অমিলে দাম্পত্যজীবন সহজলভ্য হয় না; তাই তো রহিমার ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রশংসনীয়।

চা-বিস্কুটপূর্ণ একটা ট্রে হাতে, খুব সহজ ভঙ্গিতে বসার-ঘরে ঢুকল রহিমা। টেবিলে ট্রেটা রেখে সসার আর কাপ সাজিয়ে কাজীর হাতে তুলে দিল; পরে চাচার। বিস্কুটের থালাটা নামিয়ে নিতে নিতে হেসে বলল, আপনাদের খাবার তৈরি করতে কিছুটা দেরি হচ্ছে; তাই মা দু-কাপ গরম চা দিয়ে আপনাদেরকে ঠাণ্ডা রাখতে বলেছেন।

রহিমা মিশুক মেয়ে। ক্ষণিকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা আছে ওর। ভাবলেন কাজী। রহিমার অন্তরাকাশে এ-মুহূর্তে মেঘের কোনো চিহ্ন নেই, ফাল্গুনের প্রথম কোকিল ডাকা সকাল যেন, মনোরম মলয়ানীল। সঠিক রাসায়নিক সংমিশ্রণে ঈপ্সিত ফল পাওয়া সম্ভব। তেমনি আপন রঙ মাধুরীর সুনীপুণ প্রয়োগে সৃষ্ট আপনজনের প্রতি ভাবাবেগ প্রকাশে, ভালোবাসার পরিপূর্ণতার বিকাশে সংসারজীবন আনন্দপ্রদ ও সুখদায়ক হয়ে উঠবে; অবশ্য সময় সাপেক্ষ, অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্যের সঙ্গে, বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয় চারা, তারপর বর্ধিত হয় বৃক্ষ, পরে ফুল ফলে পরিণতি হয়, সুফল নিজেকেই চমৎকৃত করে ফেলবে একদিন। কেউ কোরমা পোলাও চায়, আর কেউ লালশাকেই তৃপ্তি পায়; তৃপ্তিই হচ্ছে বড়ো কথা, উপকরণ উপলক্ষ মাত্র, তৃপ্তি দিয়ে আন্তরকে ভরপুর করে রেখো অতৃপ্ত বাসনায় যে-স্থানটা পূর্ণ আছে মনের কোণে তাকে। 'সুখের আদি ও অন্ত তোমার অন্তর'— এমনি কথা কোন বইয়ে পড়েছিলেন কাজী এখন ঠিক মনে করতে পারছেন না।

খাওয়া-দাওয়া শেষে কাজীর উপদেশে সম্মত হয়ে রহিমা বিদায় নিল চাচার সঙ্গে। বিদায় সময় তিনি ঠিকই টের পেলেন রহিমার জন্য তার অন্তরের একটা ছোট অংশ সম্পূর্ণরূপে ভরে গেছে বাৎসল্য রসে।

বাদ এশা।

কাজীর বসার-ঘরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজের সম্পাদক সেলিম আহমেদের সঙ্গে কালচার নিয়ে আলোচনা জমে উঠে। সেলিম আহমদ বললেন, 'কালচার' বাংলায় 'কৃষ্টি' বলে প্রচলিত; কিন্তু এর সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পৃক্তির কারণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাখোশ হয়ে খুঁজে বের করলেন অভিজাত শব্দ 'সংস্কৃতি'। সে-থেকে তাঁর শহুরে শিষ্যরা 'কালচার' অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটা ব্যবহার করে আসছেন; এতে অবশ্য বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সম্প্রদায় উপেক্ষিত হল।

— রবি ঠাকুরের ধুতি ধরে টানাটানি করলে আমরাই নিরাবরণ হবো। কারণ ....।

শক্ত হাতে দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ যতি টানল কাজীর অসমাপ্ত কথায়। মজলিস ছেড়ে দরজা খুলে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানালেন। তড়বড় করে তিনজন বাড়িতে ঢুকলেন। চেহারায় জেহাদী মন-মানসিকতার প্রতিফলন যেন। মাথায় গোল টুপি, ইহুদির মতো ছোট না, দাড়িও লম্বা না, ছোট করে ছাটা; নতুবা বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণার পর থেকে গোল টুপি পরার যে বাতিক দেখা দিয়েছে তাতে ইংরেজের চোখে প্রবাসি বাঙালি 'রঙিন ইহুদি' বলে পরিগণিত হত।

বসার-ঘরের দু-পাশ ঘিরে আলমারিগুলো মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা, তারই পাশ ঘেঁষে গদি মোড়ানো সোফা, বাকি ঘর ঘিরে আরাম চেয়ার, এক কোণায় একটা উঁচুকর্ণার লাইট জ্বালানো, বাকি সব আলো নেভানো, ঘরটায় একটা আবছা আবছা অন্ধকার বিরাজ করছে। সফিকুল ইসলাম এগিয়ে এসে সোফায় বসলেন। তার চোখেমুখে যেভাব ফুটে উঠছে তা কাজীর পছন্দ হচ্ছে না। লম্বা ভূমিকা দিয়ে সফিকুল ইসলাম শুরু করলেন, আপনি একটা ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কাজেই কোরআন-সুন্নাহ বিগর্হিত কোনো কাজ করে কেউ যেন আপনার কাছে প্রশ্রয় না-পায়, বরং উপযুক্ত শাস্তি পায়, সেদিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কাজীর চোখের সামনে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ, তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও তার রাগ হচ্ছে। কার সামনে কি বলতে হয় তা তারা জানে না; তাই বললেন, আপনাদের আসার উদ্দেশ্য সহজ ভাষায় প্রকাশ করুন।

তখনই কাজীর সামনে পুরনো বাঁশের হাতলওয়ালা চেয়ারে তাজিদউল্লা বসে চোখ বড়ো বড়ো করে কাজীকে দেখে নিয়ে বলল, রাগ করবেন না। আমরা এসেছি আপনার ভালোর জন্যে। আপনাকে বুঝিয়ে দিতে যে, এ অঞ্চলের মানুষের মেজাজ অল্পতেই খারাপ হয়ে যায়। তাই আপনাকে সর্তক করে দেওয়া যে, এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের মন বিগড়ে যায়।

কাজী বললেন, ছাত্রের মেজাজ-মর্জির উপর শিক্ষকের কর্মকলাপ নির্ভরশীল না। ছাত্রের জ্ঞানলাভ ও নৈতিক চরিত্র উন্নতি যদি হয় তবে শিক্ষাপদ্ধতিকে শ্রদ্ধাভরে ছাত্র ও তার অভিভাবকের মেনে নেওয়া কর্তব্য।

কাজীর দিকে সফিকুল ইসলাম না-তাকিয়েই একটা আঙুল ছাদের দিকে নির্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, জ্বিনার বিরুদ্ধে ইসলাম জিহাদ ঘোষণা করেছে, এর প্রশ্রয় দেওয়া মোনাফিকী। জ্বিনাকারিণীর শাস্তি হচ্ছে— ঢিল মেরে মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া। এমনকি কোরআনের আইনের যে বিরোধিতা করবে তার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানো মুসলমানের জন্য ফরজ।

— ঠিকই বলেছেন।

তাজিদউল্লা সায় দিল। সঙ্গে সঙ্গে সফিকুল ইসলামের মনে আরেকটা কথা মনে পড়তেই বললেন, সেদিন পড়েছিলাম পাকিস্তানি জংগ পত্রিকা। এতে লিখাছিল, 'করাচিতে এক অন্ধ মেয়েকে জ্বিনার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ইসলামিক কায়দায়।' অর্থাৎ মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। ইসলামে কোনো লোকেরই খাতির নেই।

— উপযুক্ত বিচারই বটে! তাজিদউল্লা আবারও টিকটিকির মতো সায় দিল।

সফিকুল ইসলাম একটু থেমে তারপর বললেন,— আপনার এ রহিমা মেয়েটা স্বেচ্ছায় তার স্বামীকে ত্যাগ করে বদরুল নামীয় যুবকের সঙ্গ নিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারও তাকে সাহায্য করছে, ইসলামিক ব্যবস্থা তছনছ করে দেওয়ার জন্য, তিনটা সন্তানসহ রহিমাকে হোটেলে স্থান করে দিয়ে। আর বদরুল যখন ইচ্ছে হোটেলে যাওয়া-আসা করে এবং যেভাবে ইচ্ছে মেয়েটাকে ব্যবহার করছে। প্রকাশ্য জ্বিনা— আশেককে নিয়ে আশনাই যেন।

— আপনার কথানুযায়ী বদরুল দোষী। কাজেই তার শাস্তির ব্যবস্থা করুন আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তা না-করে, একজন নিরীহ নারীর পেছনে লেগে যাবেন, এ কেমন কথা? আর সরকারকে দোষ দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে! এ পার্লামেন্টে পাশ করা আইন– 'কেউ গাছতলায় থাকতে পারবে না।' গৃহহীনকে গৃহ দেওয়া সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। শিশুদের বেলায় অবিলম্বে কাউন্সিল-প্লাট দিতে না-পারলে কাউন্সিলের খরচে হোটেলে স্থান করে দিতে হবে বই কি! সেলিম আহমদের কথার সঙ্গে কাজী যোগ করলেন, এ আইনের বদৌলতে বাংলাদেশীরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। শোনলাম আপনিও নাকি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।

সফিকুল ইসলাম বললেন, আমার ব্যাপার তো সম্পূর্ণ আলাদা, এতে কোনো বদখেয়াল নেই।

সেলিম আহমদ বললেন, না, তা থাকবে কেন? আপনি হলেন আলেম। শুধু সরকারী অনুদানের টাকা বাঁচিয়ে দেশে জমি খরিদ করছেন আর কি! লিল্লার টাকাটাকে জায়েজ করার ফন্দি শুধু। শুরুতে একটা অসত্য কথা দিয়ে ফরম পূরণ করেছেন মাত্র, তাই না!

সফিকুল ইসলাম উত্তেজিত হয়ে বললেন, অসত্য কথা?

— দেশে বা বিদেশে কোথায় আপনার মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। তারপর শান্তভাবে সেলিম আহমদ বললেন, নীতিবাদী আলেম হিসেবে আপনি আপনার জীবন বারবার বদলে জড়িয়ে পড়েছেন ঐশ্বর্যলিপ্সা, বিলাসিতা, দুর্নীতি, ভ্রান্তচিন্তা, মিথ্যাচারিতা– নানা কদাচারে। ধর্ম যদি আপনার মতো আলেমের কদাচারে লাগাম লাগতে পারল না, তবে সাধারণ মানুষের জীবনে কিভাবে পারবে?

সফিকুল ইসলাম কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, সৈয়দ সঞ্জব বাধা দিয়ে বললেন, তবে তিনি নিজে ফরম পূরণ করেননি।

— এজন্য যেটুকু ইংরেজি বিদ্যার প্রয়োজন তা থাকলে কি অমন আবুলতাবুল বলতেন?

সেলিম আহমদের এ-কটাক্ষ সফিকুল ইমলামকে উত্তজিত করে তুলল। রোষভরে বললেন, ইংরেজি বিদ্যার বাহাদুরি শোনার জন্য আমরা এখানে আসিনি। এসেছি জ্বিনার ব্যাপারে ইসলামিক আইনের সঠিক ইস্তেমাল করার জন্য।

রহিমার মুখের ছবিটা তখনও কাজীর মনের পাতায় স্পষ্ট হয়ে আছে, তাই বোধহয় তার অন্তরে কেমন একটা অজানা ব্যথা অনুভব করছেন। তিনি জানেন রহিমার জন্য একটা সুন্দর জীবন অপেক্ষা করছে, কিন্তু এ মানুষগুলো নির্দয়, এদের মতো নির্মম বোধ হয় আর কেউ হতে পারে না, তবুও উত্তাপ কমানোর উদ্দেশ্যে বললেন, এ ব্যবস্থারও রকমফের প্রকারভেদ আছে।

ফল হল উল্টো। পল্লীর জিন যেন আছড় করছে সফিকুল ইসলামের ঘাড়ে। তিনি বললেন, আপনি ইসলামের আইনের কি জানেন? মক্কা শরীফের বড়ো মসজিদের সামনে জ্বিনা অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত নারীকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রেখে ঢেকে দেওয়া হয় কালো কাপড়ে। নামাজ শেষে পূণ্যত্মা মুসল্লিরা পাথরের ঢিলা দিয়ে একে একে আঘাত করতে থাকেন কালো কাপড়ে আবৃত মাথাটাকে। কয়েক মিনিটে কালো কাপড়ের স্থানে স্থানে লাল লাল দাগ ফুটে উঠতে শুরু করে। আস্তে আস্তে সে দাগগুলো বড়ো হয়। বিস্তৃত। হাত দুটো শক্ত করে বাঁধা থাকে, তাই মাথা নড়ে শুধু। তাও এক সময়, মুসল্লিদের পুণ্যসঞ্চয় শেষে আস্তে আস্তে স্তব্ধ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়; মহাপাপের ভারে।

তাজিদউল্লার কুঞ্চিত ভ্রুর দিকে লক্ষ্য না-করে সেলিম আহমদ বললেন, কিন্তু ইসলামের নবী জ্বিনার অভিযোগকে কঠিন করে ফেলেছিলেন– অপরাধ প্রমাণ করে শাস্তিপ্রদান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে; ব্যভিচারের অভিযোগের পক্ষে চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে, অন্যথায় অভিযোগকারীর শাস্তি— আশি দুর্রা। সফিকুল ইসলামের মুখের ব্যথা উপেক্ষা করে তিনি বলে যেতে লাগলেন, আল্লামা ইউসুফ আলী এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যথোপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ ব্যতীত কোনো নারীর বিরুদ্ধে জ্বিনার অভিযোগ আনা ঘোরতর অপরাধ বলে ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। একটা খুনের আসামীর বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন তার চেয়ে এ-বিষয়ে দ্বিগুণ হওয়া উচিত। অন্যথায় অভিযোগকারীকে অপমানজনক শাস্তি ভোগ করতে হবে। ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না; তওবা না-করা পর্যন্ত। দেখলেন তো জ্বিনা সম্বন্ধে অভিযোগ আনা সহজ ব্যাপার না, উল্টো নিজে শাস্তি পাওয়ার আশংকা থাকে ষোল আনা।

আলীম ফেল করা আলেমের ইল্‌ম এঁদো পুকুরের পানির মতো, ভালো কাজে ব্যবহার করা অনুপযোগী; তাই বোধ হয় বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন না-করেই সফিকুল ইসলাম বললেন, সকলই জানে পাথর মেরে জ্বিনাকারিনীকে মারতে হয়।

কাজী কোনো কথা বললেন না। ঠিক করলেন তিনি আর কোনো কথাই বলবেন না। শুধু চুপচাপ শোনে যাবেন। বিড়ি বলতে বলতে সৈয়দ বললেন, পুরুষকে কি শাস্তি দেওয়া হয়?

সফিকুল ইসলামের চেহারা কেমন যেন করুণ দেখাচ্ছে। একটু দম নিয়ে বললেন, নরকে নেয় নারী। তারপর ছাহেব কিবলার কথা স্মরণ করে যোগ করলেন, নারী হল নরক যাত্রার তরী, কাজেই তরীকে সরিয়ে ফেললে যাত্রার সম্ভাবনা থাকে কই?

তার সাহায্যে এগিয়ে এল তাজিদউল্লা। বলল, আসল কারণ সরিয়ে ফেললে কার্যসম্পাদনা সম্ভব না।

কাজীর চোখমুখ কেমন যেন অপ্রতিভ দেখাচ্ছে; যেন মনের মধ্যে গুমড়ে ওঠা ব্যথাটা বেশ কষ্টে তিনি সহ্য করছেন। রুক্ষকঠিন গলায় সফিকুল ইসলাম বললেন, তাই তো বলি তাজিদসাব, যার এ শাস্তি প্রাপ্য তাকে বাঁচানোর জন্য ফন্দি আঁটছেন যিনি তিনিই-তো আসল পাপী।

সফিকুল ইসলামের শেষ কথায় তাজিদউল্লা বিব্রত প্রকাশ করল। ব্যস্ত হয়ে কাজীর হাত ধরে মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল, আমরা ঝগড়া করতে আসিনি। এসেছি শুধু জানতে রহিমার সম্বন্ধে।

ইংরেজ নিজ বাড়িতে অপমান সহ্য করে না, বাঙালির ব্যবহার তার বিপরীত। নিজ বাড়িতে বসে অপমান গায়ে মেখে নিতে হয়। এমনি ভাবখানা নিয়ে বসে আছেন কাজী। একই সঙ্গে ভেবে চললেন নিজ মনে, রহিমার বুকের অসহ্য ব্যথাটা এ লোকগুলো ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করছে না কেন! রহিমার ব্যাপারটা নিয়ে শুধুই মজা উপভোগ করা ছাড়া আর কিছুই না।

সৈয়দ সুখা দিয়ে নিজ হাতে তৈরি করা সিগারেটে সুখ টান দিয়ে বললেন, আমরা সবাই জানি এ-ব্যাপারে ইসলামের শাসন কত কড়া। নিজ স্মৃতির মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন সৈয়দ সঞ্জব। কি যেন খুঁজে পেলেন; তাই আবার শুরু করলেন, মনে পড়ে কয়েক বছর আগের কথা। এক সৌদি রাজকন্যাকে ছোটবংশের একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পথে তাদেরকে পাকরাও করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল— শিরোচ্ছেদ। ইসলামিক আইনে খাতির নেই। রাজাপ্রজার ভেদাভেদ নেই। সবই একাকার। ছোট-বড়ো সবাই সমান। ইসলামিক আইন মুসলমানের কাফন। সকলের জন্যে নীতিতে সমান।

গর্ব ভরে তাজিদউল্লা বলল, সৌদি আরবের মতো ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানেও একই ব্যবস্থা। এই তো সেদিনের কথা— গাজা খেয়ে স্বামী ঘৃণ্য গালিগালাজ করত বলে তার স্ত্রী পালিয়ে গিয়ে দূর সম্পর্কীয় এক দেবরের সঙ্গে গৃহবাস শুরু করে।

— এ্যাঁ! বলো কি? আঁতকে উঠলেন সফিকুল ইসলাম। স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত— এ কথা ভুলে থাকা আর কোরআন হিব্জ করে ভুলে যাওয়া, পাপের ক্ষেত্রে, একই পর্যায়ে পড়ে।

তাজিদউল্লা বলল,— ইসলামিক কোর্টে শাস্তিপ্রদান করা হয়েছিল। ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে তাকে আক্ষেপের সুযোগ দান; ধীরে ধীরে প্রাণ হরণ।

সেলিম আহমদ বললেন, জ্বিনার মতো জঘন্য কাজ সর্বথায় পরিত্যাজ্য। ব্যক্তির জীবনে অসময়ে আবেগ আলোড়ন ক্ষতিকর, পারিবারিক ভারসাম্য বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তবু তাজিদউল্লা সাবের বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বলবো, বাংলার মানুষ পাকিস্তানির মতো নিষ্ঠুর না। বাঙালি স্বামী তার পলায়নকারী স্ত্রীকে না-দেখার অভিলাষে নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করে। তাই তো আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল বলেছেন, 'এ পাপ-মুল্লুকে পাপ করেনি কে আছে পুরুষ-নারী? / আমরা ত ছার; পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারি!' আর 'ধর্মান্ধরা শোনো / অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো।'

সৈয়দ সঞ্জব প্রশ্ন করলেন, সমাজের, পঞ্চায়েতের একটা কর্তব্য আছে না?

সেলিম আহমদ উত্তর দিলেন, যে-কোনো লোক যে-কোনো পরিবেশে নিজেকে বিকশিত করার জন্য প্রাণের আহ্বান অনুভব করে, তাকে যথাসম্ভব সুযোগদানের আদর্শ স্থাপন করাই গ্রাম-বাংলার পঞ্চায়েত প্রথার গোড়ার কথা। জীবনের বোঝা হালকা করে চলার চেষ্টাই তো স্বাভাবিক। এ চেষ্টার সহায়ক হওয়াই সমাজের কাজ। টেবিলের উপর থেকে একটা পানির গ্লাস তুলে নিলেন সেলিম আহমদ। এক চুমুক পানি পান করে বলে যেতে থাকেন, আমাদের বোঝা উচিত। আমরা প্রথম যৌবনে সুন্দরী ষোড়শীকে দেখে কামনা করিনি কি তার সাহচর্য! আমাদের মাঝে এমন ক-জন আছেন, হলফ করে একথা বলতে পারেন– করেননি? পুরুষের গোনাহ্ গণ্যের মধ্যে না। পতিতালয় থেকে ফিরে এসে অজু করে নামাজ আদায় করতে এতটুকুও বাঁধে না তার। নারীকে সবরকম অমঙ্গলের হোতা বলে চিহ্নিত করা হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে। তাই তো এ অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল, 'অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়, / অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।'

দাড়ি খিলাল করতে করতে সফিকুল ইসলাম বললেন, ইসলামিক আইনকে গায়ের লেবাস করা আপনার, আমার দশের কাজ। চুরির অপরাধে হাত কাটা ইসলামিক আইন চালু করেছে পাকিস্তান। ইতিমধ্যে কয়েকটা হাতও কাটা পড়েছে। খুশিতে সফিকুল ইসলামের পেট ভরে গেল কানায় কানায়!

সেলিম আহমেদ বললেন, যেসব দেশের শাসকগোষ্ঠী ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে, সেসব দেশের অবস্থা কি– তা আমার জানা আছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ধ্বাজা যেমন আকাশচুম্বি তেমনি পতালছোঁয়া সেদেশের স্বৈরতন্ত্র, শোষণ, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ কদাচার। অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসার সর্বপথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই বলা যায়, ধর্ম উপর বিশ্বাস স্থাপন করে একটি দেশ বা সমাজ সমগ্রভাবে উন্নতিলাভ করতে পারে না।

আগুন্তক তিনজনের মধ্যে তারপর বচসা শুরু হল– পাকি প্রেসিডেন্ট ধার্মিক, না সৌদি বাদশাহ; কে বেশি ইসলামের পায়বন্দা; পাঞ্জাবি পরা বাঙালির চেয়ে লুঙ্গি পরা পাঞ্জাবি বেহেশতের পথে কত দূর অগ্রসর হচ্ছে— ইত্যাদি; ধর্মীয় মৌলিক মসলা। তাদের কথোপকথন সেলিমও উপভোগ করছেন বলে মনে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এক টুকরো কৌতুক হাসি তার ঠোঁটের কোণে লেপ্টে আছে; কিন্তু এসব কথা কাজীর কানের পর্দা ভেদ করতে পারছে না। কাজীর মন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে পাকিস্তানে ইসলামিক আইন প্রবর্তনের নামে জনগণের প্রতারণায় সরকারী তৎপরতার পর্যালোচনায়। জংগ পত্রিকার সংবাদ— বৈদেশিক সাহায্যের কোটি কোটি টাকার শতকরা চল্লিশভাগ ব্যবহার করা হচ্ছে দুর্নীতি পরায়ণে; বড়ো বড়ো সামরিক ও বেসামরিক অফিসারের পকেটে ঢুকছে এ টাকার মোটা অংশ। এদের কারও হাত কাটার তো প্রশ্ন উঠছে না; কোনোদিন উঠবেও না; কিন্তু তাদেরই তো হাত কাটা উচিত। তারা গরীবের রিজিক নানা অজুহাতে কেড়ে নিচ্ছে। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আজ গরীব হতে বাধ্য হয়েছে ইসলামিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে। সাম্যবাদের প্রদর্শিত পথ পরিবর্তন করে উৎপাদন ও বণ্টন নীতিকে আজ ধনীরস্বার্থে নিয়োজিত করছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মূলগত অনুশাসনগুলোই ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর শোষণব্যবস্থা বজায় রাখার কাজে সহায়ক, ধনী তাই গরীব মানুষকে অবদমিত করে রাখতে পেরেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মনির্দেশিত জীবনধারা কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের দিশারি হয়ে উঠতে পারছে না। বস্তাবে তা ফেল মেরেছে। বৃহত্তর সমাজ বা দেশের কল্যাণে ধর্ম-নীতিজ্ঞান একান্ত ভাবেই অন্তঃসারশূন্য। পাকিস্তান-সৌদির দিকে নজর দিলেই ধর্মের ঝমঝমার সঙ্গে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টারের রমরমা লক্ষ্য করা যায়।

সেলিম আহমদের মুচকি হাসি বরদাস্ত করতে না-পেরে সৈয়দ প্রশ্ন ছুঁড়লেন, চোরকে সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্য হাত কাটা, কোরানিক আইন কার্যকর করা কি কর্তব্য না?

— চৌর্যবৃত্তিকে নির্মূল করার চেষ্টা করবেন, তবে চোরকে না। জবাব দিলেন সেলিম আহমদ। তাকে বাদ দিয়ে সমাজ না। সকলের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করাই সামাজিক কর্তব্য। সাম্যনীতি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োগ ব্যাতিরেকে ইসলামিক শাস্তি ব্যবহার প্রচলন অবিচারের নামান্তর। প্রকারান্তরে ইসলামকে দুনিয়ার চোখে হেয়, হীন, প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কি হতে পারে! যে-ক্ষেত্রে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং এংগ্লো-মার্কিন ক্যাপিটেলিজম থেকে শ্রেয় বলে সপ্রমাণ করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত; সে-ক্ষেত্রে আমরা পাতি-চোরের পাতিলের সংবাদ সংগ্রহ করে তার হস্তচ্ছেদনে বদ্ধপরিকর। ফলে যা সর্বদেশে প্রশংসিত হওয়ার কথা তার অসৎ ব্যবহারে আজ উন্নত দেশগুলোতে নিন্দনীয় এবং পাইকারিভাবে পরিত্যাজ্য হচ্ছে।

কাজী অবশেষে মুখ খুলেন। বললেন, অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানের হাতে ছিল। জুনদিশপুর থেকে বাগদাদ-কায়রো-সিসিলি; স্পেন থেকে ক্রমবিস্তৃত বিশ্বের সর্বত্র। সত্যি কথা বলতে কি! জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে ইসলামের অবদানকে অতিরঞ্জন করা অসম্ভব। পাশ্চাত্য জগৎ যে বিজ্ঞান, কলা ও কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছে তার মূলে ছিল ইসলামের জ্ঞান-পিপাসু প্রবৃত্তি। গ্রিসের চিকিৎসাবিদ্যা ভুলে বসেছিল মধ্যযুগীয় য়ূরোপবাসী। মুসলিম পণ্ডিতগণ তা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। প্রচার করেছিলেন। ভারতীয় সংখ্যা নির্দেশক চিহ্ন, পরবর্তীতে আরবিও বলে পরিচিতি, নয়টা সংখ্যা ও শূন্য, যা বে-মানান রোমান পদ্ধতিকে অপসারিত করে অঙ্কশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে দৈনন্দিন জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। চীন থেকে আহরণ করেছিল মুসলমানরা কাগজ প্রস্তুতকরণ বিদ্যা; যা পরবর্তীতে শিক্ষাজগতে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। তদ্রূপ আড় ধনুর প্রবর্তন সমরাঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করে। এ সমস্তই হল নবীর নির্দেশে সার্থক বাস্তবায়ন; কিন্তু সে সঙ্গে একদল মুসলমান আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছে– চীনের রাজ-রাজাদের বিলাসজিন্দেগি অবলোকন করে, তার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়ে। নকশা করা রেশম, স্বচ্ছ রঙ মিশ্রিত কাচ, স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত ইস্পাত, শামিয়ানা সমন্বিত বিছানা, গালিছা, অভিনব রঙ বাহার, ধনুরাকৃতি খিলান সংযুক্ত অট্টালিকা তৈরির কৌশল, কাচের আয়না, সাধারণের জন্য স্নানাগার, বীণা বাদন, নাকড়া, চমকপ্রদ গল্প গুজব ইত্যাদি চিত্তবিনোদন সামগ্রীর সঙ্গে আরেকদল পুরুষ আবিষ্কার করেছে হারেমের আরাম। তখনকার চীন রাজের রানী ও তার তিন সহচরী ছাড়া ন-জন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী, ২৭জন

তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রী ও ৮১জন উপপত্নী ছিল। যৌন সেক্রেটারির কাজ ছিল— রাজ ভোগে পত্নী ও উপপত্নীদের যথা যোগ্য মর্যাদায় ও সময়ে উপস্থাপন করা; যৌনক্রিয়াকলাপের দিনপঞ্জিকা সংরক্ষণ করা।

অধৈর্য হয়ে তাজিদউল্লা বলল, জ্বিনা সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। তাচ্ছিল্যের সুর তার কণ্ঠে বেজে উঠল।

— প্রথমে শোনাব নবীদের নির্দেশ, তারপর অন্যদের সন্দেহ, এতেও যদি আপনার মন না ভরে উঠে, তবে পেট ভরে খাইয়ে দেব সন্দেশ। তাজিদউল্লা কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে আর অগ্রসর হতে না-দিয়ে কাজী বলে যেতে থাকেন, ঈশা বলেছিলেন, 'পাপীকে নয় পাপকে হত্যা করো। কমবেশি আমরা সবাই পাপী। সকলেরই আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন।' বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে— আলেম ও ফরীশীরা একটা স্ত্রীলোককে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ঈশাকে বলেছিলেন, 'হুজুর, এ-স্ত্রীলোক ব্যভিচারে ধরা পড়েছে। শরীয়তে মূসা এ-রকম স্ত্রীলোককে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার জন্য আমাদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি কি বলেন?' ঈশা নিচু হয়ে আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে থাকেন, কিন্তু তারা যখন কথাটা বারবার তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগল তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে বলেছিলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি কোনো পাপ করেননি, তিনিই প্রথমে তাকে পাথর নিক্ষেপ করুন।' এরপর তিনি নিচু হয়ে আবার মাটিতে লিখিতে থাকেন। এ-কথা শুনে সেসব ধর্মনেতার মধ্যে বৃদ্ধ লোক থেকে আরম্ভ করে একে একে সকলেই চলে গেলেন। ঈশা উঠে দাঁড়িয়ে সে স্ত্রীলোকটাকে বলেছিলেন, 'বোন, তারা কোথায়? কেউ কি তোমাকে শাস্তির দেওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করেনি?' স্ত্রীলোকটা উত্তর দিয়েছিল, 'না হুজুর কেউই করেনি।' ঈশা বলেছিলেন, 'আমিও করি না। আচ্ছা, যাও; পাপে আর জীবন কাটিয় না।'

তাজিদউল্লা বলল, এরকম অবস্থা আমাদের নবী কি করেছিলেন?

কাজী বললেন, নবী শাস্তিপ্রদান করার পথটা প্রায় অসম্ভব করে তুলেন যখন তিনি নীতিনির্ধারণ করেছিলেন, অভিযোগের পক্ষে চারজন সাক্ষী হাজির করতে হবে। অন্যথায় অভিযোগকারীর পাছায় পড়বে আশিটা গল্লা, বেতের বাড়ি। ভেবে দেখুন একজন নারী ও একজন পুরুষ যে কাজটা উভয়ের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী অতি গোপনে সম্পন্ন করে, সে-স্থানে, সে-সময়ে অন্য চার ব্যক্তির উপস্থিতি কল্পনাতীত, তা একমাত্র সম্ভব ধর্ষণকালে ধর্ষিতার চিৎকার শুনে চার ব্যক্তির উপস্থিতি সেখানে ঘটলে। কাজেই মনে হয় প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ ধর্ষণকারী পুরুষের প্রতিই প্রযোজ্য, মেয়ের প্রতি না; কারণ, নারী তো অত্যাচারের শিকার।

সৈয়দ সঞ্জবকে প্রশ্ন করলেন বিস্ময়াভিভূত সফিকুল ইসলাম, অমন অদ্ভুত কথা এর আগে শুনেনি কখনো?

উত্তর দিলেন কাজী, আল্লাহ্ রাসূলের বাচনভঙ্গি অসাধারণ— 'যার মধ্যে কণা মাত্র ইমান আছে, সে দোজখে যাবে না;' আবার 'কণামাত্র অহঙ্কারের অধিকারী ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না।' তাহলে ইমানদার হয়েও বেহেশতে যাবার পথ বন্ধ থাকে, যদি তার অন্তরে ধনের গৌরব, পরহেজগারী বা বংশের গৌরব এরকম কোনো অহঙ্কার স্থান পায়। তেমনি বিয়ের বিষয়ে বলেছিলেন, 'দুই, তিন, চার বিয়ে করতে পারো যদি সব স্ত্রীকে সমানভাবে ভালোবাসতে পারো।' অর্থাৎ একটা অসম্ভব শর্ত আরোপ করে দিয়েছিলেন যাতে একাধিক বিয়ে করতে না-হয়।

সিগারেটে সুখটান দিয়ে বললেন সৈয়দ সঞ্জব, নারী পুরুষের অবৈধ মিলনে নারীর দেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলে যদি না নারীর প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

— দৈহিক মিলনে নারীর দেহে প্রতিক্রিয়া যাতে না-দেখা দেয় সে ব্যবস্থা করেছে আধুনিক বিজ্ঞান। আর্থ-সামাজিক কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণকে প্রত্যেক সরকারই নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। আপনাদের পাকিস্তানি সরকার তার ব্যতিক্রম নয়।

সেলিম আহমদের কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজী বললেন,— মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে বলেই সে পশুর চেয়ে উন্নত জীব। জ্ঞান হল চিন্তার ফসল। কাজেই যে-জীব জ্ঞানী তাকে তার কাজের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে

হবে বই-কি! নারীকে চার-দেয়াল ও বোরখার অন্ধকার থেকে বের করে আনুন আলোতে। আধুনিক শিক্ষার সুযোগ করে দিন। তারপর দেখবেন নারীরা পুরুষের চেয়েও উন্নত মানুষ।

সেলিম আহমদ বললেন, কোনো উত্তেজক মুহূর্তে দুটো মানব সন্তান যদি ক্ষণিকের জন্য বৈধতা ভুলে গিয়ে তাদের জৈবিক চাহিদা মেটায় এবং পরক্ষণে মুছে ফেলতে চায় তার সেসব চিহ্ন তবে কি তাদের পদস্খলনের জন্যে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে?

কাজী বললেন, অবশ্যই না। তবে তাদের সংযমী হতে হবে। এ নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক শক্তি অর্জন, সাধনা সাপেক্ষ। তাদের মনে রাখতে হবে জীবনে সফলতা লাভের কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

জোর দিয়ে সেলিম আহমদ বললেন, ভোজনের মতো সেক্সও জৈবিক চাহিদা; পূরণকরা অবশ্যই প্রয়োজন।

কাজী বললেন, সেজন্যই তো বিবাহব্যবস্থা সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সেলিম আহমেদ বললেন, জ্বিনাকে রদ করার জন্য বাল্যবিবাহের পুনঃপ্রবর্তন করার কোনো প্রয়োজনীতা আছে কি!

বিড়িতে সুখ টান দিয়ে সৈয়দ সঞ্জব বললেন, শুধু কি বাল্যবিবাহ?

প্রশ্ন করলেন সেলিম আহমদ, মানে?

সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ বললেন, পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি প্রয়োগ প্রয়োজন আর হারেমের পর্দা মুসলিম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক– এসব লেখা আছে বিখ্যাত নেয়ামুল কোরআন কিতাবে।

— বহুবিয়ের ফলে যে হারেমের সৃষ্টি, সভ্য জগতে যা নিন্দনীয়, এ-নিয়ে গর্ব করার মতো কূপমণ্ডুক আমরা কি করে হতে পারি, ভেবে পাই না।

সেলিম আহমদকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কাজী বললেন, অসম্ভব কিছু নয়। আমরা মুসলমানরা যে সুলেমান বাদশাকে নিয়ে গর্ববোধ করি, যিনি একাধারে বিশিষ্ট নবী ও ক্ষমতাধর বাহশাহ্ ছিলেন, যার তাবে জিন-ইনসান ছাড়াও পশুপক্ষী ছিল বলে সাধারণ মুসলমানের বিশ্বাস, আরেম-উলেমার বর্ণনা থেকে জানা যায় বায়ু পর্যন্ত তাঁর হুকুম তামিল করতো; সে মহাপুরুষের সাত-শ পত্নী ও তিন-শ উপপত্নী ছিল; বছরে এক-দু-রাতের বেশি তিনি কি কোনো একটা মেয়ের শয্যাসঙ্গী হতে পেরেছিলেন? তাদের অতৃপ্ত যৌনকামনা মেটানোর জন্যে যাতে অন্য পুরুষের সাহায্য নিতে না-হয় তজ্জন্য প্রহরায় নিযুক্ত করা হত শত শত শিশ্নচ্ছেদন যুবককে। কি নিষ্ঠুর সুলতানী ব্যবস্থা!

সেলিম আহমদ সায় দিয়ে বললেন, তবু কি হারেমকে জ্বিনা মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছিল? তবে বিজ্ঞানের বিজয়ের পর থেকে জ্বিনার মতো মামুলী ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা লোপ পেয়েছে। তাই বলি— বর্তমান যুগে জ্বিনাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো মানে হয় না। হিংসা, দ্বেষ, প্রতারণা, ঘুষ ইত্যাদি দুষ্কৃতি কর্মকাণ্ডের চেয়ে জ্বিনা অনেক কম ক্ষতিকর।

— তবু মনে রাখতে হবে ভোজনে ও সঙ্গমে সংযম অবলম্বন জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করার পূর্ব শর্ত। কাজীর বক্তব্যের তাৎপর্যতা উপলব্ধি না-করেই সফিকুল ইসলাম বললেন, আল্লাহ্ আলীমুল গায়েব। আল্লাহ্ কোন আইন কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। আমাদের জ্ঞানের বাইরে যা আছে তা বোঝার চেষ্টা করা নিরর্থক; পালন করার মধ্যে জীবন সার্থকতা লাভ করে শুধু। আখেরে বেহেশতে পৌঁছে যাবো— যেখানে সত্তর জন হুরী অপেক্ষায় আছে প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্যে।

— আপনি দেখি যৌনক্ষুধা মেটানোর তদবীরে লেগে গেছেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় বেহেশত সম্বন্ধে আপনার ধারণা বড়োই নিচু।

পাটখড়িতে অগ্নিসংযোগের মতো সেলিম আহমদের কথায় ধপ্ করে জ্বলে উঠলেন সফিকুল ইসলাম, বেসুন্নতী ছুরত ও লেবাসওয়ালা মানুষ ইসলামের বুঝে কি?

সেলিম আহমদ বললেন, আপনার মতো বেহেশতকে বেশ্যালয়ে পরিবর্তন করার প্রবৃত্তি আমার নেই।

— ছোট মুখে বড়ো কথা। এ-বলে চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়ালেন সফিকুল ইসলাম। এর আগেই কাজী বুঝতে পেরেছিলেন, যুক্তি দিয়ে এ আগুন্তককে বোঝানোর চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য; তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য। এ-তপ্ত তর্কে তাৎক্ষণিক ইতি টানার উদ্দেশ্যে বললেন, একথা ঠিক যে-কোনো বিষয় বোঝার জন্যে সে-বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সর্বোপরি কাণ্ডজ্ঞান নেহাত জরুরি, অন্যথায় বোঝানো সম্ভব না। শিক্ষকের পণ্ডশ্রম মাত্র। এ প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে জাগ্রত হওয়া কি স্বাভাবিক না, যে-পুরুষের ফুসলানোতে রহিমা পদস্খলন হল সে-পুরুষ সমাজের রোষাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে না কেন? যাক, যে নারীকে নাহেজাল করার জন্য আপনারা ভেবে ভেবে সারা, তার সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আগামীকাল পঞ্চায়েতে উপস্থিত মুরব্বীয়ান সক্ষম হবেন বলে আমার ধারণা। কাজেই অগ্রিম ভেবে কারও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানোর কোনো সংগত কারণ দেখছি না।

কাজীর কথায় মোল্লা সফিকুল ইসলাম, রাজাকার তাজিদউল্লা ও সুবিধাবাদী সৈয়দ সঞ্জব কতটুকু আশ্বস্ত হলেন, তাদের দাড়ি ঘেরা মুখ দেখে ঠিক বোঝা গেল না। ইতিমধ্যে তিন অতিথির সঙ্গে সেলিম আহমদকে বিদায় সম্ভাষণ সমাপন করে কাজী জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের অমর বাণী মনে মনে জপতে লাগলেন, 'কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে, / ফুটিয়ে অযুত বিমল কমল কামনা কালিয় দহে।'

(চলবে...)